#আমি পদ্মজা পর্ব ১৩

_____

বাড়ির গিন্নির মতো কোমরে ওড়নার আঁচল গুঁজে রান্নাবান্না করছে পদ্মজা। হেমলতার কোমরে ব্যাথা। তিনি রান্না করতে চাইলেও পদ্মজা রাঁধতে দিল না। মোর্শেদও বললেন, ‘বেদনা লইয়া রান্ধা লাগব না। তোমার মাইয়া যহন রানতে পারে তে হেই রান্ধক।’

শেষ অবধি হেমলতা হার মানলেন। পদ্মজা মাটির চুলায় মুরগি মাংস রান্না করছে। খড়ি বা লাকড়ি হিসেবে আছে বাঁশের মুড়ো। আগুনের শিখার রং নীলচে। শীতের মাঝে রান্নার করার

শান্তি আলাদা। মুরগি মাংস রান্না হচ্ছে। আজ এতিম-মিসকিন খাওয়ানো হবে। হেমলতা বলেন, সামর্থ্য থাকলে মাসে একবার হলেও এতিম-মিসকিনদের খাওয়ানো উচিৎ। নয়তো ঘরে রহমত থাকে না। রান্না শেষ করে পদ্মজা হেমলতার কাছে এলো। বলল, 'আম্মা, রান্না শেষ।'

শুকনো মুখখানা তুলে তাকালেন হেমলতা। বললেন, 'তোর আব্বারে গিয়ে বল, আলী,মুমিন,ময়না তিনজনরে নিয়ে আসতে।'

পদ্মজা কিছু না বলে মাথা নিচু করে ফেলল। মোর্শেদের সাথে আগ বাড়িয়ে

কথা বলতে তার ভয় হয়। অনেকদিন বাজে ব্যবহার করেন না। হুট করে যদি করে ফেলেন। কষ্ট হবে। হেমলতা মৃদু হাসলেন। বললেন,'কিছু বলবে না। যা তুই।'

পদ্মজা দূর্বল গলায় বলল, 'সত্যি যাব?'

হেমলতা মাথা সামনে ঝুঁকে ইঙ্গিত করেন, যাওয়ার জন্য। পদ্মজা মোর্শেদকে উঠানেই পেল। মোর্শেদ চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন। পদ্মজা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসল। আব্বা ডাকতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। ঢোক গিলে ডাকল, 'আব্বা?'

মোর্শেদ তাকান। পদ্মজার মনে হলো বুকে কিছু ধপাস করে পড়ল। পদ্মজা দৃষ্টি অস্থির রেখে মিনমিনে গলায় বলল,'আম্মা বলছে, আলীদের নিয়ে আসতে।'

' রান্ধন শেষ?'

'জি, আব্বা।'

মোর্শেদ গলায় গামছা বেঁধে বেরিয়ে যান। পদ্মজা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। পদ্মজার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসল। তাড়াতাড়ি ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। গাছ থেকে

পাখির কিচিরমিচির শব্দ আসছে। সে সেদিকে তাকাল। তখনি হেমলতা ডাকলেন, ‘পদ্ম।’
পদ্মজা ছুটে গেল। হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকে বলল, ‘কিছু লাগবে আম্মা?’
‘না। পূর্ণারা কোথায়?’
‘ঘাটে।’
‘কী করে?’
‘মাছ ধরে।’
‘বড়শি দিয়ে?’
‘জালি দিয়ে।’
‘এতো বড় মেয়ে নদীতে নেমে জাল দিয়ে মাছ ধরে! আচ্ছা, থাকুক। তুই আয়। বস আমার পাশে।’

পদ্মজা হেমলতার পায়ের কাছে বসল। পায়ে হাত দিল টিপে দেওয়ার জন্য। হেমলতা পা সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, ‘লাগবে না।’
এরপর শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজার কপালের ঘাম মুছে দিলেন। বললেন, ‘কোমরের ব্যাথাটা কমে আসছে। তোর আব্বা কিছু বলছে?’
‘না, আম্মা। আচ্ছা আম্মা, আব্বা এতো পাল্টাল কী করে?’

হেমলতা মৃদু হাসেন। উদাস হয়ে টিনের দেয়ালে তাকান। এরপর বললেন, ‘তোর বাপ ভালো মানুষ শুনছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর তার

ভালমানুষি দেখিনি ভুলেও। কারণ, তার কানে, মগজে মন্ত্র দেয়ার মানুষ ছিল। অন্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না তাই পাল্টাচ্ছে। তোর বাপের ব্যক্তিত্ব নাই। নিজস্ব স্বকীয়তা নাই। অন্যের কথায় নাচে ভালো।'

শেষ কথাটা হেমলতা হেসে বললেন। পদ্মজা কিছু বলল না। হেমলতা শুয়ে পড়লেন। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিবেন। আগামীকাল অনেক কাজ। অনেকগুলো কাপড় জমেছে।

'রূপ ক্ষণিকের, গুণ চিরস্থায়ী। শেষ বয়েসে এসে আব্বা বুঝছে।'

পদ্মজার শীতল কণ্ঠ এবং কথার তীরে হেমলতা ভীষণভাবে চমকালেন। তিনি সেকেন্ড কয়েক কথা বলতে পারলেন না। পদ্মজা চলে যাওয়ার জন্য উপক্রম হয়। হেমলতা অবিশ্বাস্য স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, ‘এই খবর কোথায় শুনেছিস?’

পদ্মজা ঘাড় ঘুরে ফিরল। বলল, ‘আমি তো তোমারই মেয়ে, আম্মা।’

পদ্মজা চলে গেল। রেখে গেল হেমলতার অবিশ্বাস্য চাহনি।

বিকেলবেলা হেমলতা ঘর থেকে বের হলেন। শরীরে শান্তি এসেছে। পূর্ণা বরই ভর্তা করছিল। পাশে প্রেমা। পদ্মজাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ঘাটে বসে

আছে। প্রান্তও তো নেই। হেমলতা পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পূর্ণা, প্রান্ত কোথায়?’

পূর্ণা কয়েক সেকেন্ড ভাবল কী উত্তর দিবে। এরপর ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, ‘জানি না আম্মা।’

‘জানস না কী? প্রেমা, প্রান্ত কই?’

প্রেমা সহজ স্বরে বলল, ‘আমরা ঘাটে ছিলাম। প্রান্ত উঠানে ছিল। এরপর এসে দেখি নাই।’

হেমলতা গলা উঁচিয়ে বলেন, ‘কোন মুখে বলছিস জানি না? একসাথে নিয়ে থাকতে পারিস না। একা ছাড়িস কেন? কোথায় গেছে ছেলেটা।’

পদ্মজা বাড়ির পিছন থেকে ছুটে আসল। হেমলতার ধমক ঘাট অবধি শোনা গেছে।
‘কী হয়েছে?’
‘প্রান্ত বাড়ি নাই। দুইটা এই কথা বলেও নাই। বসে বরই ভর্তা করে খাচ্ছে। দিন দিন অবাধ্য হচ্ছে মেয়েগুলো।’

পূর্ণা ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। প্রেমা হেমলতার ধমকে ভয় পাচ্ছে কিন্তু অতোটা না। হেমলতার মন কু গাইছে। তিনি নিজ রুমে যেতে যেতে পদ্মজাকে বললেন, ‘বের হচ্ছি আমি। সাবধানে থাকবি।’

দুজন লোক প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। প্রান্তর কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। পদ্মজা হেমলতাকে ডাকল, ‘আম্মা।’ এরপর দৌড়ে এলো উঠানে। প্রান্ত কাঁদছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন৷ প্রান্তকে আহত অবস্থায় দেখে ভড়কে যান। বুকটা হাহাকার করে উঠে। তিনি ছুটে আসেন। প্রান্তকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে লোক দুটিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী হয়েছে?’

একজন লোক বলল, ‘পলাশ মিয়ার ছেড়ার লগে মাইর লাগছিল। হেই

ছেড়ায় পাথথর দিয়া ইডা মারছে। আর ফাইট্টা গেছে।’

মোর্শেদ লাহাড়ি ঘরের সামনে গাছ কাটছিলেন। চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসেন। প্রান্তকে এমতাবস্থায় দেখে লোক দু’টিকে তেজ নিয়ে বললেন, ‘কোন কুত্তার বাচ্চায় আমার ছেড়ারে মারছে? কোন বান্দির ছেড়ার এতো বড় সাহস?’

মোর্শেদ উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। প্রান্তকে নিয়ে ছুটে যান বাজারে। হেমলতা রয়ে গেলেন বাড়িতে। বাজারে আজ হাট বসেছে। মোর্শেদ হেমলতাকে নিষেধ করেছেন সাথে

যেতে। বাড়িতে থেকে হেমলতা হাঁসফাঁস করতে থাকেন। প্রান্ত একা বড় হয়েছে। কতবার কতরকম আঘাত পেয়েছে। দেখার কেউ ছিল না। তাই মিনমিনিয়ে কেঁদেছে। এমন বাচ্চা ছেলের এতো বড় আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদার কথা। কষ্ট তো আর কম পায়নি! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। হেমলতার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজা ঘরে লুকিয়ে কাঁদছে। পূর্ণা, প্রেমা বাড়ির বাইরে বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, মোর্শেদ প্রান্তকে নিয়ে ফিরল নাকি!

_____

দেখতে দেখতে চলে এলো মেট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্র শহরে। যেতে লাগে ছয় ঘন্টা। বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশেই মোর্শেদের মামা বাড়ি। মামা নেই। মামাতো ভাইয়েরা আছে। কথাবার্তা বলে, সেখানেই দেড় মাসের জন্য হেমলতা আর পদ্মজা উঠল। মোর্শেদ বাকি দুই মেয়ে আর প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে রয়ে গেছেন। হেমলতা পদ্মজাকে নিয়ে আসার পূর্বে এসে দেখে গেছেন, পরিবেশ কেমন। মোর্শেদের দুই মামাতো ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজধানীতে থাকে।

আরেকজনের বয়স হয়েছে অনেক। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে একাই থাকেন। ছেলেরা শহরে চাকরি করে। পদ্মজার জন্য উপযুক্ত স্থান। তাই আর অমত করেননি।

মোর্শেদের যে ভাইটি বাড়িতে আছেন, তার নাম আকবর হোসেন। ষাটোর্ধ বয়সের একজন মানুষ। তবে আকবর হোসেনের স্ত্রী জয়নবের বয়স খুব কম। হেমলতার বয়সী। হেমলতা আকবর হোসেনকে ভাইজান বলে সম্বোধন করেন। দালান বাড়ি। বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে। ফলে, পদ্মজা মন দিয়ে পড়তে পারছে। পরীক্ষাও ভাল করে

দিচ্ছে। হেমলতা আকবর হোসেনের দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। শীতল প্রকৃতির লোক। তিনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাসী লোক। রাতের খাবার আকবর হোসেনের সাথেই খেতে হয়। হেমলতা দেড় মাসের খাওয়ার খরচ নিয়ে এসেছেন। আকবর হোসেন কিছুতেই আলাদা রাঁধতে দিচ্ছেন না। এভাবে অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হেমলতার আত্মসম্মানে লাগে। তিনি কথায় কথায় জানতে পারেন, আকবর হোসেন এবং জয়নবের নকশিকাঁথা খুব পছন্দ। তাই তিনি নকশিকাঁথা সেলাই করছেন। যতক্ষণ পদ্মজা পরীক্ষা দেয় ততক্ষণ

হেমলতা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

অনেক রাত অবধি পদ্মজা পড়ে। আজ অনেকক্ষণ ধরে সে কী যেন ভাবছে৷ হেমলতা ব্যাপারটা খেয়াল করেন। পদ্মজার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করেন, ‘পদ্ম, কী ভাবছিস?’

পদ্মজা এক নজর হেমলতাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। হেমলতা তাকিয়ে আছেন, জানার জন্য। পদ্মজা দ্বিধা নিয়ে বলল, ‘রাগ করবে না তো?’ হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নিলেন। এরপর বললেন, ‘ কী জানতে চাস?’

পদ্মজা এদিক-ওদিক চোখ বুলায়। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুই মিনিট পর নিরবতা ভেঙে বলল,’ দুপুর থেকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, হানিফ মামাকে কে মারল। তোমার সাথে মামার কী কথা হয়েছিল? হানিফ মামাকে... মানে তুমিতো অন্য কারণে গিয়েছিলে। কিন্তু ফিরে এলে। খুনও হলো। আমি সবসময় এটা ভাবি। কখনো উত্তর পাই না। মনে মনে অনেক যুক্তি সাজাই। কিন্তু যুক্তিগুলো মিলে না। খাপছাড়া, এলোমেলো।’
‘কাল পরীক্ষা। আর আজ এসব ভেবে সময় নষ্ট করছিস।’

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। তবুও পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। তবে কিঞ্চিৎ আশা মনে উঁকি দিচ্ছে।

চলবে....